আধুনিকায়নের বাহন
Agent of Modernization

ইউনিট - ৯

ভূমিকা :

ঐতিহাসিকভাবে আধুনিকায়নের উদ্ভব হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, মধ্যযুগের শেষভাগের স্বায়ত্তশাসিত নগর রাষ্ট্রগুলো, মধ্যযুগের বাণিজ্যিক অগ্রগতি এবং প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতে আধুনিকায়নের সূচনা করেছিল। মূলত: ইউরোপের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও রেঁনেসার মধ্য দিয়েই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। বর্তমান শতকের পঞ্চাশের দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আধুনিকীকরণ তত্ত্বটি নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়।
আধুনিকায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই একটি মাত্র উপাদান বা একক মাত্রা দ্বারা একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আধুনিকায়ন সকল মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তা ও আচরণের সকল দিকের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আধুনিকায়নের উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হচ্ছে: শিল্পায়ন, নগরায়ন, সামাজিক গতিশীলতা, গণমাধ্যমের বিকাশ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রসার সাধন। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া আপনা-আপনিই বিকশিত হয় না। আধুনিকায়নের বিকাশ ও প্রসার সাধনের জন্যে বিভিন্ন বাহন প্রয়োজন। মূলত: বিভিন্ন বাহনের উপর ভিত্তি করেই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া গতি লাভ করে। এই ইউনিটে আমরা আধুনিকায়নের যে সকল বাহন নিয়ে আলোচনা করব তা হল :

- *পাঠ - ১ রাজনৈতিক দল*
- *পাঠ - ২ ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব*
- *পাঠ - ৩ বুদ্ধিজীবী*
- *পাঠ - ৪ আমলাতন্ত্র এবং*
- *পাঠ - ৫ গণমাধ্যম*

পাঠ - ১

রাজনৈতিক দল
Political Party

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এডমন্ড বার্ক (Edmund Burke) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, যখন কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে একটি সংগঠিত জনসমষ্টি যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সচেষ্ট হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করা যায়। অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, রাজনৈতিক দল হল সম-রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নাগরিকগণের সেই সংগঠিত অংশ, যা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। অধ্যাপক গেটেল (Gettell) বলেছেন, রাজনৈতিক দল বলতে মোটামুটিভাবে সংগঠিত এমন একটি নাগরিক সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা একটি রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং যারা তাদের ভোটদান ক্ষমতার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নীতিগুলোকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে।

> রাজনৈতিক দল সম আদর্শভূক্ত নাগরিকদের একটি সংগঠিত অংশ, যারা নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনায় আগ্রহী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দেয়া এ সকল সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দল সম আদর্শভুক্ত নাগরিকদের একটি সংগঠিত অংশ, যারা নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনায় আগ্রহী।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যঃ

রাজনৈতিক দলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়, যথা-

১. রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ সম-মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।
২. প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনই তার প্রধান উদ্দেশ্য রূপে বিবেচিত হয়।
৩. জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে নিরন্তর আলাপ-আলোচনার মাধ্যেমে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ মতাদর্শের সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়।
৪. ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সমর্থন লাভ করলে দলীয় কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হয়।
৫. পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে, গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে চেষ্টা করতে হয়।

রাজনৈতিক দলের গুরুত্বঃ

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, বিশেষ করে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। রাজনৈতিক দল যে সকল কারণে গুরুত্বপূর্ণ তা হল-

রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থ এবং ঐক্যের প্রতীক। রাজনৈতিক দলসমূহ ব্যাপক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে গঠিত হয়। দলের লক্ষ্য হল, জাতির সর্বাঙ্গীণ স্বার্থ রক্ষা এবং জাতীয় ঐক্যকে সংহত করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু সংগঠন গঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলের মত তাদের কোন ব্যাপক কর্মসূচী ও নীতি থাকে না।

রাজনৈতিক দল দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির রূপরেখা প্রণয়ন করে। প্রতিটি দলই নিজ নিজ মতাদর্শ অনুযায়ী কর্মসূচী স্থির করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে রাজনৈতিক দল নিজের মতামত পেশ করে। কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব , রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর মাধ্যমেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ধরনের সমাধানের পথ-নির্দেশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের এ ভূমিকার ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়। একমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার সম্ভব। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রচারকার্য, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ বক্তব্য জনসমক্ষে প্রকাশ করে। তাদের প্রচারকার্যের মাধ্যমেই জনসাধারণ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং অনেক তথ্য জ্ঞাত হয়। এর ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা প্রসারিত হয়।

রাজনৈতিক দল সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করে। গণতান্ত্রিক দেশে সরকার এবং বিরোধী দল থাকে। সরকার এবং বিরোধী পক্ষ জনসাধারণের কাছে নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরে। বিরোধী দলের নিরন্তর সমালোচনা সরকার পক্ষকে নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের এ সতর্ক প্রহরার জন্যই কোন সরকারের পক্ষে যথেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল কেবল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিজের সদস্যদেরই সংগঠিত করে না, সাধারণ অরাজনৈতিক মানুষকেও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্ধুদ্ধ করে।

দল রাজনৈতিক জীবন এবং প্রশাসনে সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলে । বর্তমান রাজনৈতিক দলসমূহ সংগঠিতভাবে মতাদর্শ, কর্মসূচী এবং দেশের সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করে। এর ফলে জনসাধারণের পক্ষে বিভিন্ন দলের কর্মসূচী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হয়। কিন্তু দেশে কোন রাজনৈতিক দল না থাকলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে হত। সাধারণ মানুষের অগণিত মতামতের মধ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। দলহীন অবস্থা সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি করত।

রাজনৈতিক দলকে অনেকে উন্নত সরকার গঠনের উৎস নামে অভিহিত করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোন ব্যক্তিই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচিত হবার সুযোগ পায়। আধুনিক দল-শাসিত সরকারের বেশির ভাগ সদস্য কোন-না-কোন দলের সমর্থনে নির্বাচিত হন। ভোটদাতাদের সমর্থনলাভের জন্য প্রত্যেক দলই উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত করে। এ কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীদের মনোনীত করার ফলে তাদের দ্বারা গঠিত সরকারও নিপুণ হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দল দেশের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্যের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যেমন মতাদর্শ ও কর্মসূচীগত পার্থক্য থাকে, তেমনি অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতৈক্যও লক্ষ্য করা যায়। এ মতৈক্যের ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক বিরোধের মাত্রা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলে। রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের প্রধান মাধ্যম হল দল। জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে যত বেশি রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ এবং উৎসাহ তত বেশি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত আরও বেশি সংগঠিত আকার ধারণ করে।

রাজনৈতিক দল হল জমনত গঠন এবং রাজনৈতিক মতামত ও বিশ্বাস সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি, আইনসভা, প্রচার, পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে সুষ্ঠু এবং কল্যাণকামী মতামত গড়ে তোলে। রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের উন্মেষেও রাজনৈতিক দল মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে যত বেশি বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বও তত বেশি বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের হাতেই সরকার গঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। সরকার জনসাধারণের কাছে নিজের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে দায়বদ্ধ। জনসাধারণ বিভিন্ন দলের কর্মসূচী বিশ্লেষণের পরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন্ দলকে তারা সমর্থন জানাবে। বিরোধী পক্ষ একদিকে যেমন সরকার পক্ষকে সমালোচনা করে তাকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে, অন্যদিকে পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। এর ফলে রাজনৈতিক পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ পথে সংগঠিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দল সনাতন সামাজিক-সংগঠনের পরিধি হতে মানুষকে বৃহত্তর সংগঠনে একত্রিত করে। ফলে বর্ণগত, গোষ্ঠীগত চেতনা ভেঙ্গে গিয়ে আধুনিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এছাড়া, রাজনৈতিক দল ব্যাপক গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে আধুনিকতাগামী করতে সক্ষম হয়। এ কারণে রাজনৈতিক দলকে আধুনিকায়নের বাহক হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সারকথাঃ
রাজনেতিক দল সম আদর্শভুক্ত নাগরিকদের একটি সংগঠিত অংশ, যারা নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনায় আগ্রহী। রাজনৈতিক দলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- এক বা অভিন্ন আদর্শের অনুসরণ, সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য, নিজের অবস্থানের পক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা, ক্ষমতা দখল বা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের অভিপ্রায়। প্রতিটি আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব রয়েছে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বেশী। রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির রূপরেখা প্রণয়ন করে। এছাড়া, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার, স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ও অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। কোন্ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দল গঠিত হয়?

ক) জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ
খ) বিশ্ব মানবতার সেবা
গ) ব্যক্তিগত উৎকর্ষ
ঘ) গোষ্ঠী স্বার্থ অর্জন।

২। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

ক) আর্ত মানবতার সেবা করা
খ) গণশিক্ষার বিস্তার ঘটানো
গ) সরকার গঠন করে দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা
ঘ) সবার জন্য স্বাস্থ্য চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

৩। কোন ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

ক) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায়
খ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়
গ) রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়
ঘ) সামরিক শাসন ব্যবস্থায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিন।
২। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর: ১. ক, ২. গ, ৩. খ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। Alan Ball, Modern Politics and Government.
২। Maurice Duvarger, Political Parties.

পাঠ - ২

ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব
(Charismatic Leadership)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন।
- ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্বের উপাদান মূলত: তিনটি (১) নেতা, (২) অনুগামীবৃন্দ এবং (৩) পরিস্থিতি।

নেতৃত্ব একটি বিশেষ গুণ। কোন বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতার মাধ্যমে অন্যদের পরিচালনা করতে পারে, তাহলে ব্যক্তির সেই সামর্থ্যকেই নেতৃত্ব বলে। সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞা, মেধা ও আচরণ যদি সেই গোষ্ঠীর অন্যদের আকৃষ্ট করে তাহলে তারা নেতার অধীনে সংগঠিত হয় এবং তার নির্দেশ মেনে চলে। লা পিয়ের ও চার্লসওয়ার্থ নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'অপর ব্যক্তিদের আচরণ নেতাকে যতখানি না প্রভাবিত করে, নেতৃত্ব হলো সেই আচরণ যা অপর ব্যক্তিদের আচরণকে অধিকতর প্রভাবিত করে'। নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো নেতা তার দলকে বহুল পরিমাণে উদ্দীপিত করেন, কিন্তু দলের দ্বারা নিজে বিশেষ উদ্দীপিত হন না। নেতা তার অনুগামীদের চিন্তা ও আচরণকে যতটা প্রভাবিত করেন, অনুগামীদের চিন্তা ও আচরণ দ্বারা ততটা প্রভাবিত হন না।

হল্যান্ডার এবং জুলিয়ান-এর ভাষায়, "নেতৃত্ব হচ্ছে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া"। নেতা যাদের তার অনুগামী মনে করছেন তারা যদি নেতাকে স্বীকার করে না নেয় তবে নেতৃত্ব অর্থহীন হয়।

নেতৃত্ব কোন ব্যক্তি নয়, একটা প্রক্রিয়ামাত্র। এ প্রক্রিয়ার তিনটি উপাদান রয়েছে, যার কোন একটিকে বাদ দিয়ে নেতৃত্বের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। এ তিনটি উপাদান হলো (১) নেতা, (২) অনুগামীবৃন্দ এবং (৩) পরিস্থিতি। নেতা এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকলেও কেবল তার কাজই নেতৃত্ব নয়, অন্যান্য অনুগামীবৃন্দ এবং পরিস্থিতির চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য নেতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেতৃত্ব মূলতঃ নেতা ও অনুগামীদের সম্পর্কের ফলশ্রুতি।

ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

যে সকল নেতার মধ্যে সম্মোহনী ক্ষমতা থাকে এবং এ ক্ষমতা ব্যবহার করে যারা অন্যকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে পারেন তাদেরকে ক্যারিসম্যাটিক নেতা বলা হয়।

'Charisma' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আধ্যাত্মিক শক্তি বা সম্মোহনী ক্ষমতা। এই শব্দটি ধর্মীয় অর্থে ভক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারের ক্ষমতা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কালক্রমে 'Charisma' শব্দটি ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স ওয়েবার 'কর্তৃত্ব' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "ক্যারিসম্যাটিক কর্তৃত্বের" ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। ওয়েবার কর্তৃত্বকে প্রধানত: তিনভাগে বিভক্ত করেন : সনাতন কর্তৃত্ব, আইনগত-যৌক্তিক কর্তৃত্ব ও ক্যারিসম্যাটিক কর্তৃত্ব। ম্যাক্স ওয়েবারের কর্তৃত্বের বিভাজন হতেই অলৌকিক বা সম্মোহনী নেতৃত্বের ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনায়, বিশেষ করে নেতৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করে। ওয়েবারের মতে, সম্মোহনী শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি তার অতিপ্রাকৃত গুণাবলীর ভিত্তিতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দাবি করেন। তিনি এক প্রকার অতিমানব 'Super-Man' হিসেবে প্রতিভাত হন।

বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কিছু কিছু নেতা আছেন যাদের মধ্যে সবাইকে আকর্ষণ করার বা সম্মোহিত করার ক্ষমতা থাকে। অর্থাৎ যেসকল নেতা অন্যদের সম্মোহিত করে তাদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করার যোগ্যতা রাখেন তাদেরকেই ক্যারিসমেটিক নেতা বলা হয়।

ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন -

ক্যারিসম্যাটিক নেতার মধ্যে এমন কিছু অতি-মানবিক এবং অতি প্রাকৃতিক গুণাবলী থাকে, যার ফলে তার নেতৃত্বকে উৎকৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নেতার প্রতি অনুসারীদের গভীর বিশ্বাস এবং অনুসারীদের প্রতিও নেতার প্রচন্ড আস্থা সৃষ্টি হয়। নেতা যে ভাবে পরিচালিত করেন অনুসারীরা সেভাবেই চালিত হয়। অনুসারীদের প্রত্যাশা সর্ম্পকেও নেতা সচেতন থাকেন। নেতা ও অনুসারীদের মধ্যকার এ গভীর সম্পর্কই ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের মূলকথা।

সম্মোহনী প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে ক্যারিসম্যাটিক নেতা তার উত্তরাধিকার নির্বাচন করে তার হাতে ক্ষমতা অর্পন করেন। এক্ষেত্রে সাধারণত: তার ঘনিষ্ট ও আস্থাভাজন এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই মনোনীত করা হয়।

ধারাবাহিকভাবে ক্যারিসম্যাটিক নেতার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় কর্তৃত্ব, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

ক্যারিসম্যাটিক নেতার সম্মোহনী ক্ষমতার ব্যবহার বহুলাংশে তার নিকট-সহকর্মীদের সামাজিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও গণভোটের মাধ্যমে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যারিসম্যাটিক নেতা বাগ্মিতা কিংবা বিশেষ প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপর তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ভূমিকা:

সামাজিক পরিবর্তন এবং আধুনিকায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুরনো সামাজিক ব্যবস্থা হতে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণে, রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় এবং যে কোন ধরনের সংকটকালে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। এ কারণে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বকে আধুনিকায়নের বাহক হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করবো।

পুরনো সমাজ হতে আধুনিক সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের অবদান লক্ষ করা যায়। ইউরোপে প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক সমাজের যে উত্থান ঘটেছিল তা মার্টিন লুথারের সম্মোহনী নেতৃত্বের কারণে গতিলাভ করেছিল। এছাড়া, ভারতীয় সমাজের সনাতন প্রথা ভেঙ্গে আধুনিক সমাজের যে অভিযাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে, তার নেপথ্যে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানো , স্বাধীনতা অর্জন এবং সংবিধান প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন প্রমুখের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব রাষ্ট্র গঠন ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক ছিল।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং নিপীড়িত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে মার্টিন লুথার কিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ট কৃষ্ণকায় জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে নেলসন ম্যান্ডেলার সম্মোহনী নেতৃত্ব নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক বিপ- বে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গণ জাগরণ সৃষ্টি করে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর বৈপ- বিক পরিবর্তন সাধনে সম্মোহনী নেতৃত্বের অবদান লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে চীনের মাও সে তুং এবং ভিয়েতনামের হো-চি-মিনের নাম সর্বাগ্রে উলে- খযোগ্য।

উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করা এবং উপনিবেশিক শাসকদের বিতারিত করার ক্ষেত্রে সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা ইতিহাসে সুস্পষ্ট। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতে গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্নো,বার্মায় জেনারেল আউং সান, সিংহলে বন্দরনায়েক, ঘানায় নক্রুমা প্রমূখের নেতৃত্বের কারণেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। ফলে এসকল নতুন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে।

জনগণকে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করা এবং সম্প্রসারনবাদী তৎপরতায় নিয়োজিত করার ক্ষেত্রেও সম্মোহনী নেতৃত্ব কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর হিটলার ও ইতালির মুসোলিনি তাদের নেতৃত্বের গুণে জার্মান জাতিকে একত্রিত করতে এবং বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিল।

যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা যুদ্ধ সংক্রান্ত জাতীয় সংকটে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্ব জনগণের মনোবল এবং ঐক্য টিকিয়ে রাখতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিল ইংরেজদের মনোবল রক্ষা করেছে দৃঢ়তার সাথে। ইরাকে পাশ্চাত্যের আক্রামনের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেন জনগণকে একত্রিক রাখতে পেরেছে তার সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণে।

ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের এ সকল ভূমিকা ও অবদানের কারণে একদিকে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারিত হয়েছে, অপরদিকে স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়েছে। তবে সম্মোহনী নেতৃত্বের কারণে স্বৈরাচারের জন্ম হতে পারে। তাই সম্মোহনী নেতৃত্বের কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। তবে ব্যতিক্রমকে নিয়ম হিসেবে গণ্য করার কোন অবকাশ নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বকে সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের বাহন হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সারকথাঃ
যে সকল নেতা অন্যদের সম্মোহিত করে তাদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করার যোগ্যতা রাখেন তাদেরকেই ক্যারিসম্যাটিক নেতা বলা হয়। ক্যারিসম্যাটিক নেতার মধ্যে কিছু অতি মানবিক এবং অতি প্রাকৃতিক গুণাবলী থাকে। এ ক্ষেত্রে নেতা ও অনুসারিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নেতা যেভাবে পরিচালিত করেন, অনুসারীরা সেভাবেই পরিচালিত হয়। মূলতঃ পুরনো সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে। বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। নেতৃত্ব গঠন প্রক্রিয়ার উপাদান কয়টি?

ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. পাঁচটি
ঘ. ছয়টি।

২। ক্যারিসম্যাটিক কর্তৃত্বের ধারণা কে প্রকাশ করেন?

ক. আইডান ফস্টার কার্টার
খ. লা পিয়ের
গ. ম্যাক্স ওয়েবার
ঘ. কার্ল মার্কস।

৩। ম্যাক্স ওয়েবার নেতৃত্বকে কত ভাগে বিভক্ত করেছেন?

ক. দুইভাগে
খ. তিনভাগে
গ. চারভাগে
ঘ. পাঁচভাগে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায়?
২। ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করুন ।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. খ।

সহায়ক গ্রন্থ:

Encyclopedia of Social Sciences (Charismatic Leadership).

পাঠ - ৩

বুদ্ধিজীবী
(Intellectual)

উদ্দেশ্যে
এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধিজীবী কারা তা বলতে পারবেন।
- বুদ্ধিজীবীদের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বুদ্ধিজীবীদের পেশাগত অবস্থানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

বুদ্ধিজীবী কারা?

বুদ্ধিজীবী শব্দটি ইংরেজি 'Intellectuals' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে বুদ্ধিজীবী বলতে বাংলাদেশে আইনজীবীদের বুঝানো হতো। একারণে বিনয় ঘোষ Intellectual শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'বিদ্বৎ সমাজ'। তবে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি Intellectual শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীগত অবস্থান কি? সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহেইম মনে করেন বুদ্ধিজীবীরা নিজেরা কোন শ্রেণী নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা অবস্থান করেন। গোল্ডনারের মত হল, বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। আবার মার্কসবাদীরা বুদ্ধিজীবীদের সমাজের মধ্যস্তরের সাথে অধিক পরিমাণে সংযুক্ত বলে মনে করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার পন্ডিতমহল কর্তৃক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়। 'বুদ্ধিজীবী' বা 'Intellegentsia' শব্দটি সর্বপ্রথম তারাই ব্যবহার করেন। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কতিপয় বিশেষ গুণ ও সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করে তাদের বিশেষ সামাজিক অবস্থান মেনে নেয়া হয়। তখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুকরণ করার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।

যাদের উন্নত আধুনিক শিক্ষা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে বুদ্দিবৃত্তিক দক্ষতা তারাই বুদ্ধিজীবী।

অধুনা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বলতে কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের বুঝানো হয়। কিন্তু এ ধারণাকে অনেকেই যথেষ্ট সংকীর্ণ বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, যারা বুদ্ধিবৃত্তি লালিত ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বিধানে ন্যস্ত তারাই বুদ্ধিজীবী হওয়ার দাবি রাখে। তাদের ধারণা অনুসারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্প ও দার্শনিকবৃন্দ সকলেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ চরিত্র নিয়ে আলোচনা করে র‌্যামন্ড অ্যারণ (Raymond Aron) দেখিয়েছেন যে, যেভাবেই হোক না কেন বুদ্ধিজীবীরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় এবং সামাজিক জীবনবোধের মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করে। তার ভাষায়, 'বুদ্ধিজীবীরা হল ধারণার সৃজনকারী ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারক'।

বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদানে আরো অনেক ধারণা রয়েছে। মিশেল্স-এর মতে, 'বুদ্ধিজীবী তারাই যারা পেশাগতভাবে নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা ও মননের মাধ্যমে যে কোন ধরনের বিষয় সম্পর্কে বিচার বিশে- ষণ করতে সক্ষম'। এডওয়ার্ড শিলস্ লিখছেন, 'বুদ্ধিজীবী তারাই যাদের উন্নত আধুনিক শিক্ষা রয়েছে এবং সেইসাথে রয়েছে বুদ্ধিজীবী চেতনা ও দক্ষতা। সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহেইমের মতে, 'প্রত্যেক সমাজে নানা গোষ্ঠীভূক্ত এমন কিছু লোক থাকেন যাদের কাজ হলো সেই সমাজের জীবন-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী রচনা করা ও ব্যাখ্যা করা। যারা সমাজের এই জীবন-দর্শন রচনা ও ব্যাখ্যা করেন, তারাই বিদ্যৎ সমাজের অন্তর্ভূক্ত হবার যোগ্য—তারাই প্রকৃত বিদ্যৎজন।'

সমাজবিজ্ঞানীদের এসকল বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, যিনি অবশ্যই বিদ্যা চর্চা করেন, যিনি সুদক্ষ ও সৃজনশীল, মানসিক সংগ্রামে রত থাকেন, আদর্শগত সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং সর্বোপরি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা প্রয়োগ করেন তিনিই বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য হবেন।

বুদ্ধিজীবীদের বিভাজন

ইতালীয় দার্শনিক এন্থনী গ্রামসী বুদ্ধিজীবীদের প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করেছেন: জৈব বুদ্ধিজীবী ও প্রথাগত বুদ্ধিজীবী। গ্রামসীর মতে, নতুন সমাজ বিকাশের সাথে সাথেই জৈব বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ ঘটে। যেমন, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা তথা আন্তারপ্রেনিয়ার (বিনিয়োগকারী) শ্রেণীর বিকাশের সাথে সাথেই জন্ম নেয় শিল্প প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ, বাজার-ব্যবস্থাপক, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও আইনবিদ। এই বুদ্ধিজীবীরা নতুন সমাজে নিজেদের পরিচয় ও ভূমিকা স্পষ্ঠ করে তোলে এবং নিজ সমাজের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপরদিকে, প্রথাগত বুদ্ধিজীবীরা কোন বিশেষ শ্রেণীর বিকাশ অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়নি। এরা মূলত, প্রাচীন সমাজ ও ঐতিহাসিক পরম্পরার প্রতিভূ। পুরোহিত শ্রেণী প্রথাগত বুদ্ধিজীবীর পর্যায়ভূক্ত। এরা ধর্মীয় মতাদর্শ, প্রাচীন যুগের দর্শন ও বিজ্ঞান এবং তার সাথে শিক্ষা, নীতিজ্ঞান, বিচার ব্যবস্থা, দয়াধর্ম, সদাচার–এসবের চর্চা ও বিকাশ ঘটিয়েছেন।

> বুদ্ধিজীবীদের গ্রামীণ ও নাগরিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিক্ষানিক এইভাবে বিভক্ত করা যায়।

গ্রামসীর জৈব ও প্রথাগত বুদ্ধিজীবীর এই বিভাজন ছাড়াও বুদ্ধিজীবীদের গ্রামীণ ও নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক–এইভাবেও বিভাজিত করা যায়। সাধারণতঃ ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, গ্রাম্য ডাক্তারএদেরকে গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী এবং প্রযুক্তিবিদ, ব্যবস্থাপক, আইনবিদ, সাংবাদিকএদেরকে নাগরিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য করা হয়।

এছাড়া, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মে নিয়োজিত থাকে তাদেরকে বলা হয় প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী। আর যারা প্রতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের আওতার বাইরে থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে নিয়োজিত থাকে তাদেরকে বলা হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী। ম্লান দত্ত এদেরকে 'চিন্তক' নামে অভিহিত করেছেন। সাধারণত- অধ্যাপক, আইনবিদ, সাংবাদিক, গবেষক–এরা প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীর পর্যায়ভুক্ত এবং কবি, সাহিত্যিক, শিল্প, দার্শনিক-এরা অপ্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃত।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে বুদ্ধিজীবীদের পেশাগত অবস্থান

উন্নয়নশীল দেশসমূহে (এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা) বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকেন। এসকল পেশার মধ্যে রয়েছে সিভিল সার্ভিস, আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, প্রকৌশল, স্থাপত্য কলা প্রভৃতি। এসকল পেশাতেই প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবীদের থাকতে দেখা যায় এবং এই প্রতিটি পেশার জন্যই বুদ্ধিবাদী দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তিবিদ, শিল্প রসায়নবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, হিসাবরক্ষক, পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, প্রজননতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ক্ষুদ্র হলেও তাদেরকে এ শ্রেণী থেকে কিছুতেই বাদ দেয়া যায় না। এরা সকলেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এই শেষোক্ত পেশাগুলোতে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা উপনিবেশিক যুগে যেমন স্বল্প ছিল, বর্তমানেও অনেকটা সেই অবস্থায়ই রয়েছে। তবে সময়ের বিবর্তনে এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বিশ্বে উন্নত দেশসমূহে ছাত্র সম্প্রদায়কে (Student Community) বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হয় না। কিন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছাত্র সম্প্রদায়কে এই পর্যায়ে ফেলা হয়। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ছাত্রদেরকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অংশ বলে বিবেচনা করা হতো। কেননা, স্বাধীনতা-আন্দোলনে তারা সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটতো এবং বুদ্ধিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতো। ছাত্র সম্প্রদায় মূলত দু'টো কারণে জনগণের আনুকূল্যও লাভ করতো।

প্রথমত: , তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতো।

দ্বিতীয়ত:, তারা বিদেশী শাসন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাবার মন্ত্রে দীক্ষিত হতো।

বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা

সামাজিক অগ্রগতি এবং আধুনিকায়নে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের বাহন হিসেবে অভিহিত করা হয়। মূলত: বুদ্ধিজীবীরা সমাজের এমন একটি অগ্রসর অংশ, যারা অন্যদেরকে পথ দেখায় এবং পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করে। একারণে বুদ্ধিজীবীদের সমাজ প্রগতির পথিকৃত বলা হয়।

এখন আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা তুলে ধরবো:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা উৎপাদনের নতুন ও আধুনিক উপকরণ সৃষ্টি করে। এর ফলে পুরনো বা সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জন্ম নেয় নতুন নতুন শ্রেণী। ফলে জীবন ব্যবস্থায় সূচিত হয় পরিবর্তন। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-যাপনে মানুষ অভ্যস্ড় হয়ে উঠে। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডের ফলেই উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। একারণে বস্তুগত সুবিধা সম্প্রসারিত হয়, উন্নত হয় সমাজ ও ব্যক্তি-জীবন।

বুদ্ধিজীবীরা শুধু উৎপাদন ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটায় না, দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন আনে। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুরনো মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ইউরোপের রেঁনেসা আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। এর ফলে বিজ্ঞান মনস্কতা ও ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছিল। বেঁকন, কোপার্নিকাস, লিউনার্ডো দ্য ভিঞ্চি প্রমুখ বুদ্ধিজীবী তাদের আবিস্কার ও উদ্ভাবন এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সামাজিক জাগরণ তথা আধুনিকতার বিকাশ ঘটেছিল সে সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ফলেই।

রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে তোলা ও প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। জাতীয়তাবাদ, উদারতাবাদ, গণতন্ত্র এসকল ধারণা বুদ্ধিজীবীদেরই চিন্তার ফসল। মাৎজিনি, স্টুয়ার্ট মিল, লিংকন প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই এসকল রাজনৈতিক দর্শনের রূপকার। শুধু রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব–ইতিহাসের এসকল মহান পরিবর্তনও ঘটেছে বুদ্ধিজীবীদের কারণেই। রুশো, ভল্টেয়ার ফরাসি বিপ্লবের এবং পে-খানভ রুশ বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তি সৃষ্টি করেছিলেন। কাজেই, রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও ভূমিকার কারণেই বাস্তব রূপ লাভ করে।

বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও সৃজনশীল কর্মকান্ডের ফলে মানবিক অনুভূতি এবং নৈতিক বোধ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, জোলিও কুরি, বারট্রান্ড রাসেল, জ্যঁ-পল সার্ত্র, নোয়াম চমস্কী প্রমুখ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর লেখনি মানুষের সামাজিক ও নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করেছে নি:সন্দেহে।

জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরা একটি নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় গঠন করেন। জাতীয় সুনাম গঠন করার জন্য তাঁরা ক্রমান্বয়ে নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ আবিস্কার করেন এবং একে জনমনের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধির মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

জাতীয় আদর্শ চিহ্নিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। বুদ্ধিজীবীরা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। দ্রুত সামাজিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে এ ধরণের জাতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে কাম্য।

উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করা তথা বিদেশী শাসকদের বিতারিত করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই এশিয়া ও আফ্রিকায় জনগণকে সংগঠিত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাদের নেতৃত্বের কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে অনেকগুলো নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধিজীবীরা জাতি-গঠন ও রাষ্ট্র গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও সৃষ্টির প্রভাবে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক চেতনা পরিবর্তিত হয়ে বৃহত্তর জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়।

বুদ্ধিজীবীদের কর্মকান্ডের ফলে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক গতিশীলতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হারও বেড়ে যায়–যা রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় উন্নয়নের পথ-নির্দেশ করে এবং উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার উপাদান হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। এছাড়া, বুদ্ধিজীবীদের প্রণোদনা, ট্রেনিং ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতি লাভ করতে পারে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল–সকল ধরণের সমাজ ও রাষ্ট্রেই বুদ্ধিজীবীদের কর্মকান্ড যত বেশি সেই সমাজই তত আধুনিক ও উন্নত। কেননা, বুদ্ধিজীবীদের মেধা ও মননই আধুনিকতা ও উন্নয়নের মূল শক্তি।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠে ব্রিটিশ আমলে। তখন থেকেই বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ধর্ম সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারে সে সময়ে বুদ্ধিজীবীরা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ কারণেই গোখলে বলেছিলেন ‘বাংলা আজকে যা ভাবে, ভারত তার পরদিন তাই ভাবে।’ অর্থাৎ চেতনার দিক দিয়ে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ছিল ভারত বর্ষের পথ-প্রদর্শক। রাজনৈতিক আন্দোলনেও বাংলার বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের আইনজীবীগণ, যেমন, সিআর.দাস, পি.আর.দাস, শেরে বাংলা প্রমুখের রাজনৈতিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পাকিস্তান আন্দোলনেও বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম প্রমুখ বুদ্ধিজীবী হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া শিক্ষিত মুসলমানদের যে অংশে বুদ্ধি বৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, তারা পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজবী সমাজ ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত প্রতিহত করা এবং জনগণকে সচেতন করে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ড় তাৎপর্যপূর্ণ। সে সময়ে সাহিত্য, চলচিত্র, সাংবাদিকতা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীদের চিন্ড়া ও সৃষ্টির প্রভাবে সাধারণ মানুষ উদ্দিপ্ত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা শুধু চিন্ড়া ও সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক জনমত গঠন থেকে শুরু করে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। বর্তমানেও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা অন্যায়, অবিচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

সারকথাঃ

বুদ্ধিজীবী বলতে কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন ব্যক্তিদের বুঝানো হয়। সাধারণতঃ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পি, দার্শনিক, সাংবাগিক, আইনজীবী, অধ্যাপক ইত্যাদি পরিচয়ে যারা মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মে নিযুক্ত থাকেন, তারাই মূলতঃ বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক পরিবর্তনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেননা, সৃষ্টিশীল কর্ম ও অগ্রসর চিন্তার মাধ্যমে তারাই পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করে থাকেন। একারণেই উন্নত ও অনুন্নত সকল সমাজেই বুদ্ধিজীবীদের সমাজ বিকাশের ইঞ্জিন হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. কোন্ সমাজবিজ্ঞানীর মতে বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী?

ক. ম্যানহেইম

খ. র‌্যামন্ড অ্যারণ

গ. গোল্ডনার

ঘ. ম্যাক্স ওয়েবার।

২. মার্কসবাদীরা বুদ্ধিজীবীদের সমাজের কোন্ স্তরের সাথে অধিক পরিমাণে সংযুক্ত বলে মনে করেন?

ক. উচ্চ শ্রেণী

খ. মধ্য শ্রেণী

গ. নিম্ন শ্রেণী

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. উনবিংশ শতাব্দীতে কোন দেশের পন্ডিত মহল বুদ্ধিজীবীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন?

ক. স্পেনের

খ. ফ্রান্সের

গ. জার্মানীর

ঘ. রাশিয়ার।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। বুদ্ধিজীবী বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?

২। গ্রামসীর মতানুসারে জৈব বুদ্ধিজীবী ও প্রথাগত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। সংক্ষেপে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকায়নে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ.

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Edward Shils, Intellectuals and the Powers and Other Essays.

২. Antonio Gramsci, Selecions From Prison Notebooks.

আমলাতন্ত্র
Bureaucracy

পাঠ - ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আমলাতন্ত্রের অর্থ জানতে পারবেন।
- আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আমলাতন্ত্রের অর্থ

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিয়ুক্ত কর্মচারীরা হল শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ। তাঁরা রাষ্ট্রকৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্যক (civil servent) নামে পরিচিত। সাধারণভাবে এদের 'আমলা' বলে অভিহিত করা হয়। এদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 'আমলাতন্ত্র' (Bureaucracy) বলা হয়। 'আমলাতন্ত্র' বা ব্যুরোক্রেসী শব্দটি ফরাসি শব্দ 'ব্যুরো' (Bureau) এবং গ্রীক শব্দ 'ক্রেটিন' (Kratein) থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 'ব্যুরো' অর্থ 'লেখার টেবিল' এবং 'ক্রেটিন' শব্দের অর্থ 'শাসন'। অর্থাৎ শব্দগত অর্থে ব্যুরোক্রেসী বলতে 'টেবিল-শাসনব্যবস্থা' বোঝায়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করা অদ্যাবধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই অনেকে নিন্দাসূচক অর্থে 'আমলাতন্ত্র' কথাটি প্রয়োগ করেন। আবার কেউ কেউ 'মূল্যমান-নিরপেক্ষ' অর্থে আমলাতন্ত্র' কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' (Encyclopaedia Britannica)- তে আমলাতন্ত্র বলতে বিভিন্ন দপ্তরের হস্তে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের স্থায়ী কর্মচারিগণের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপকে বোঝানো হয়েছে। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল–এর মতে আমলাতন্ত্র বলতে এমন একটি ব্যাপক সংগঠনকে (Elaborate Organization) বোঝায় যার মাধ্যমে শাসকবর্গ (Rulers) বা বিধি-প্রণেতারা (জঁষবসধশবৎং) নিজেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন। মোটামুটি ভাবে আমলাতন্ত্র বলতে আমরা অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ এবং স্থায়ী সরকারি কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই বুঝি।

> অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই আমলাতন্ত্র বলা হয়।

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়,যথা:

স্থায়িত্ব : স্থায়িত্ব হল আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি নিদিষ্ট বয়:সীমা পর্যন্ত আমলা বা সরকারী কর্মচারীগণ স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে। সাধারণত দুর্নীতি পরায়ণতা, অযোগ্যতা কিংবা চাকরির শর্তাবলী ভঙ্গের প্রমাণিত অভিযোগ ছাড়া তাদের পদচ্যুত করা যায় না।

প্রশাসনিক কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা : আধুনিক গণতন্ত্র দলীয় শাসন বলে সরকারের ঘন ঘন পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সরকারের এরূপ উত্থান-পতনের মধ্যে প্রশাসনিক কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার দায়িত্ব আমলাদের।

নিরপেক্ষতা : আমলাতন্ত্রের অন্যতম উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নিরপেক্ষ ভাবে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন করা। বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে পারে কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সরকারী নীতিসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করা আমলাদের কর্তব্য।

অজ্ঞাতনামা থাকা : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমলাদের অজ্ঞাতনামা থেকে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে রাজনৈতিক প্রশাসকদের নামে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয়। তাই প্রশাসনিক কার্যের সুনাম বা দুর্নামের অংশীদার তাদের হতে হয় না।

দায়িত্বশীলতা : অজ্ঞাতনামা থেকে কার্য সম্পাদন করতে হয় বলে সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্যে আমলাদের জনগণ কিংবা আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্যে তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট দায়িত্বশীল থাকে।

নিয়মানুবর্তিতা : সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতা আমলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করা কিংবা বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সম্পাদিত কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। তাই আমলাদের কঠোর নিয়মশৃংখলা মেনে চলতে হয়।

নিয়োগ : সাধারণত বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমলাদের নিয়োগ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে অবশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পদ-প্রার্থীদের যোগাযোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জনকল্যাণ সাধন : জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক পরিমাণে জনকল্যাণ সাধন করা। সরকারের বিপুল পরিমাণ জনকল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব আমলাদের হস্তে অর্পিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই জনকল্যাণ সাধনকেই প্রধান কাজ হিসেবে তারা গ্রহণ করে।

নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন : আমলাদের নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। কোন শ্রেণীর আমলা কোন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করবে তা সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত থাকে।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব

আমলাতন্ত্র আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় অপরিহার্য এবং আধুনিকীকরণের বাহক হিসেবে এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা-ক. শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ যেমন, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিমন্ডলী ইত্যাদি এবং খ. শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ যেমন , স্থায়ী সরকারি কর্মচারীবৃন্দ বা আমলাগণ। রাজনৈতিক প্রশাসকগণ সরকারি নীতিসমূহ নির্ধারণ করেন এবং অ-রাজনৈতিক প্রশাসন গৃহীত নীতিসমুহকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। সাম্প্রতিককালে নানা কারণে রাজনৈতিক প্রশাসকদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব কমে গেছে এবং আমলাতন্ত্রে গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি : উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ছিল পুলিসি রাষ্ট্র (Police State)। তখন রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মনে করা হোত যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে দেশরক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা বজায় রাখাই হল রাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক , সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল কার্য সম্পাদন করতে হয়। এইসকল ভিন্নমুখী কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক প্রশাসকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদের নির্ভর করতে হয় বহু সংখ্যক স্থায়ী এবং অনুগত সরকারী কর্মচারীদের উপর।

রাজনৈতিক প্রশাসকদের জ্ঞানের অভাব : আইন প্রণয়ন কিংবা সরকারি নীতি নির্ধারণের জন্য যে পরিমাণ কলাকৌশলগত জ্ঞান (Technical Expertise) এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের কিংবা সকল মন্ত্রীর থাকে না। তাই তারা সরকারের সাধারণ নীতি কিংবা আইনের মৌল নীতিসমূহ নির্ধারণ করে সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব স্থায়ী, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী আমলাদের উপর অর্পণ করেন। ফলে সকল রাষ্ট্রে বিশেষত উন্নতিকামী রাষ্ট্রসমূহে, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসকবৃন্দের অভাব : রাজনৈতিক প্রশাসকদের কার্যকাল রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভরশীল বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখার কাজে তারা ব্যস্ত থাকেন। প্রশাসনিক কার্যে মনোনিবেশ করার মতো সময় তাঁদের থাকে না। তা ছাড়া, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের উপর রাজনৈতিক প্রশাসকদের কার্যকালের মেয়াদ নির্ভরশীল বলে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আমলাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর থাকে না।

রাজনৈতিক প্রশাসকগণ শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষায় অক্ষম : সুশাসনের জন্যে প্রয়োজন শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তিত হয়। আজ যে সরকার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, আগামীকাল সেই সরকার ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসকদের পক্ষে শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অ-রাজনৈতিক প্রশাসক বা আমলাদের হস্তে ন্যস্ত হয়।

সরকারি আইন, নীতি প্রভৃতির রূপায়ণে আমলাদের ভূমিকা : সর্বোপরি, আইনসভা-প্রণীত শাসন, শাসনবিভাগ কর্তৃক রচিত নীতি এবং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত না হলে সেগুলো মূল্যহীন হয়ে যায়। তার ফলে সরকারের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ অকার্যকর থেকে যায়। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সরকারি আইন, নীতি প্রভৃতির বাস্তব রূপায়ণ নির্ভরশীল সরকারি কর্মচারীদের আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার উপর। তাই বর্তমানে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আধ্যাপক ফাইনার বলেছেন, স্থায়ী সরকারি কর্মচারীগণের সাহায্য ছাড়া আধুনিক সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব।

জাতি গঠনে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা : পরিবর্তনশীল সমাজগুলোতে জাতি গঠনে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও নৈর্ব্যক্তিকতার কারণে জাতি-গঠন ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া, আমলাতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে। আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, তার ভাবধারা ও সংস্কৃতি আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার জন্য ইতিবাচক। একারণে আমলাতন্ত্রকে আধুনিকায়নের বাহক হিসেবে গণ্য করা হয়।

সারকথাঃ

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের স্থায়ী কর্মসম্পাদনকারী ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের 'আমলা' নামে অভিহিত করা হয়। এককথায়, অভিমত, নিরপেক্ষ এবং স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই আমলাতন্ত্র বলা হয়। আমলাতন্ত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলঃ স্থায়ীত্ব, প্রশাসনিক কাজে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা, নিপেক্ষতা, অজ্ঞাতনামা থাকা, দায়িত্বশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ব্যবস্থা, জনকল্যাণের এখতিয়ার। যে কোন রাষ্ট্রেই আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আমলাদের ভূমিকা আরো ব্যাপক। আমলাতন্ত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া প্রশাসন পরিচালনা কার্যত অসম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। রাষ্ট্রকৃত্যকদের (Civil Servant) কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক. নেতা

খ. আমলা

গ. ব্যবস্থাপক

ঘ. মন্ত্রী।

২। শব্দগত অর্থে 'আমলাতন্ত্র' বলতে কি বুঝায়?

ক. টেবিল-শাসনব্যবস্থা

খ. নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

গ. গতানুগতিক শাসনব্যবস্থা

ঘ. লালফিতার দৌরাত্ম।

৩। সরকারের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মূলত কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়?

ক. দুইটি

খ. তিনটি

গ. চারটি

ঘ. পাঁচটি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। আমলাতন্ত্রের অর্থ কি?

২। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। আমলাতন্ত্রের কুফলগুলো কি?

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ক, ৩. খ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। Peter M. Blau, Bureaucracy in Modern Society.

গণমাধ্যম
(Mass Media)

পাঠ - ৫

উদ্দেশ্যে

এ পাঠ শেষে আপনি -

- গণমাধ্যমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- গণমাধ্যমের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।
- গণমাধ্যমের কার্যকারিতা জানতে পারবেন।
- গণমাধ্যমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

গণমাধ্যমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

গণমাধ্যম হলো এমন একটি মাধ্যম যার সাহায্যে সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

গণমাধ্যমের কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন -

গণমাধ্যম যে কোন ধরনের বার্তা যুগপৎভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেয়। গণমাধ্যমের পাঠক বা শ্রোতৃমন্ডলীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা রয়েছে এবং এদের সংখ্যাও ব্যাপক। এই বিপুল পরিমাণ মানুষ গণমাধ্যমের আওতাভুক্ত।

বার্তা নৈব্যক্তিক। অর্থাৎ সবার জন্যে অভিন্ন বার্তা একই মান ও স্টাইলে পরিবেশিত হয়।

গণমাধ্যমের সাহায্যে সর্বস্ড়রের জনসাধারণের কাছে যে বার্তা পরিবেশিত হয়, পরিধি ব্যাপক হবার কারণে তার ‘ফিডব্যাক’ বিলম্বে আসে।

গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বার্তা প্রেরণ করা হয় কোন সংগঠনের মাধ্যমে। ফলে গণমাধ্যম হতে সঞ্চারিত তথ্য-প্রবাহে বিভিন্ন জনের ভূমিকা থাকে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য প্রেরিত হয়।

গণমাধ্যমের প্রকারভেদ

গণমাধ্যমকে প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

> গণমাধ্যম মূলতঃ তিন প্রকার। যথা- ১. সনাতন গণমাধ্যম, (২) আধুনিক গণমাধ্যম ও (৩) অত্যাধুনিক গণমাধ্যম।

১. সনাতন গণমাধ্যম, (২) আধুনিক গণমাধ্যম ও (৩) অত্যাধুনিক গণমাধ্যম। সনাতন গণমাধ্যমের মধ্যে গণ্য করা হয় লোক কাহিনী, লোক সংগীত, লোক নাট্য ইত্যাদিকে। আধুনিক গণমাধ্যমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুদ্রিত বার্তা, তার যোগাযোগ, বেতার-টেলিভিশনের সম্প্রচার, আলোকচিত্র ও চলচিত্র। অত্যাধুনিক গণমাধ্যম হল আধুনিক গণমাধ্যমের আরো উন্নততর পর্যায়। তবে আধুনিক গণমাধ্যমগুলো এখনও যোগাযোগের সবচেয়ে কার্যকর ও ব্যাপক প্রচলিত মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। এখন আমরা আধুনিক গণমাধ্যমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

মুদ্রণ : গণমাধ্যম হিসেবে মুদ্রণ ব্যবস্থার সূচনা হয় খ্রীস্টের জন্মেরও বহু বছর পূর্বে। প্রথম পর্যায়ে কাঠ অথবা পাথরে খোদাই করে মুদ্রণ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে ছাপাখানা আবিস্কারের মাধ্যমে মুদ্রণ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হল। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে গণমাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব ও ভূমিকাও ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। মুদ্রণ ব্যবস্থার কল্যাণে সংবাদপত্র অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

তার যোগাযোগ : উনিশ শতকে তার যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হলেও গণমাধ্যম হিসেবে এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিনেও বিস্তৃতি লাভ করেনি। ১৮৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৩০ হাজার টেলিফোন গ্রাহক ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ গণমাধ্যমটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯.০ মিলিয়ন। অর্থাৎ তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে এটিও শক্তিশালী গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

বেতার ও টেলিভিশন : বেতার ও টেলিভিশনের মতো সম্প্রচার ব্যবস্থার সবচেয়ে সুবিধা হল দূর-দূরান্তে বার্তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। এ ধরনের গণমাধ্যমের ব্যবহারও সহজতর। বেতার

টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার কাছে বার্তা পৌঁছতে পারে। ফলে আধুনিককালে গণমাধ্যমে হিসেবে বেতার ও টেলিভিশনের গ্রাহক সংখ্যা ও গুরুত্ব উভয়ই বেড়েছে।

আলোকচিত্র : আধুনিক গণমাধ্যম হিসেবে আলোকচ্চিত্রের গুরুত্বও কম নয়। আগে শুধু পেশাদার আলোকচ্চিত্র শিল্পিরাই এ মাধ্যমে ব্যবহার করতো। কিন্তু বর্তমানে পেশাদার-অপেশাদার নির্বিশেষে এ মাধ্যম ব্যবহাত হচ্ছে। আলোকচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌছানো সম্ভব। কেননা, দৃশ্যমান স্থির চিত্রের সাহায্যেও সাধারণ মানুষ ঘটনা অবহিত হতে পারে।

চলচ্চিত্র : চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। প্রথম দিকে নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রচলন হলেও পরবর্তীতে চিত্র ও কণ্ঠের সমন্বয়ে চলচিত্র আধুনিক রূপ লাভ করে। বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহের ব্যাপক বিস্তারের ফলে বিভিন্ন স্ড়রের মানুষ চলচ্চিত্রের দর্শকে পরিণত হয়েছে। চলচ্চিত্র বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

অত্যাধুনিক গণমাধ্যম : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো আরো উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছে। গুণগত মান এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও বেড়ে গেছে। অত্যাধুনিক এ সকল গণমাধ্যম গুলো হল:

ক. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, বিশেষ করে ইন্টারনেট
খ. ফ্যাক্স
গ. ক্যাবল টিভি
ঘ. অডিও-ভিডিও ক্যাসেট
ঙ. তার বিহীন (Wairless), মোবাইল টেলিফোন
চ. স্যাটেলাইট ইতাদি।

গণমাধ্যমের কার্যকারিতা

গণমাধ্যম বহুবিধ লক্ষ্য সামনে রেখে কার্য সম্পাদন করে। এগুলো হল--

গণমাধ্যম প্রধানত: সকল পর্যায়ের মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প-সংস্কৃতির জগতে যে সকল সৃষ্টি ও উদ্ভাবন ঘটছে তার তথ্যাবলী প্রেরণ করা গণমাধ্যমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

গণমাধ্যম শুধু তথ্যই প্রদান করে না, গণমাধ্যম মানুষকে প্রভাবিত করে। যে কোন ইস্যুর পক্ষে বা বিপক্ষে গণমাধ্যমের প্রচারণার ফলে মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে রেডিও, টিভি এবং সংবাদপত্রের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

> গণমাধ্যম গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখে, সামাজিক সত্ত্বাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে।

গণমাধ্যম মানুষকে বিনোদন দেয়। বিশেষ করে রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র-এসকল গণমাধ্যম বিনোদন মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

গণমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা বিষয়সূচী নির্ধারণ (Agenda Setting) করে এবং তার ভিত্তিতে প্রচারণা কর্মসূচী গ্রহণ করে। গণমাধ্যম কর্তৃক নির্ধারিত এজেন্ডা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব লাভ করে।

গণমাধ্যম 'গণব্যক্তিত্ব' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের সাহায্যে অনেক সময় ইমেজ ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

গণমাধ্যমকে পৌন:পুনিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এ কারণে কোন গণমাধ্যমেরই উপযোগিতা নি:শেষ হয়ে যায় না।

গণমাধ্যমের গুরুত্ব

আধুনিক কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যে সকল ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায় তা হলো :

গণমাধ্যম গণসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নাগরিক দায়িত্ব, অধিকার বোধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এ সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সজাগ ও সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গণমাধ্যম জনসাধারণকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এর ফলে উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারিত হয়।

গণমাধ্যম শুধু উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রেই নয়, অনেক সময় জনসাধারণকে অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ থেকে বিরতকরণেও ভুমিকা রাখে। বিশেষ করে মাদক সেবন, নারী নির্যাতন, শিশু শ্রম ব্যবহার ইত্যাদি কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

গণমাধ্যম জনমত গঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখে। এর ফলে শাসকদের মধ্যে স্বৈরাচারী প্রবণতা গড়ে উঠতে পারে না এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

গণমাধ্যম যে কোন সামাজিক সত্তাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

গণমাধ্যমের এসকল ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উন্নত-অনুন্নত সমাজ নির্বিশেষে গণমাধ্যমের বিকাশ গণতন্ত্রায়ন ও উন্নয়নের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে স্বীকৃত।

সারকথাঃ

গণমাধ্যম এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। গণমাধ্যম যুগপৎভাবে বার্তা পরিবেশন করে। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে নৈর্ব্যক্তিকতা, পরিধির ব্যাপকতা এবং সংগঠন। আধুনিক গণমাধ্যমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ মুদ্রণ, তার যোগাযোগ, বেতার ও টেলিভিশন, আলোকচিত্র, বেতার ও টেলিভিশন, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি। গণমাধ্যম শুধু তথ্যই পরিবেশন করে না, গণমাধ্যম মানুষকে সচেতন করে বিনোদন দেয় এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বার্তা কিসের মাধ্যমে প্রেরিত হয়?
ক. ব্যক্তির মাধ্যমে
খ. সংগঠনের মাধ্যমে
গ. সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে
ঘ. সংবিধানের মাধ্যমে

২. গণমাধ্যম সাধারণত : কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. ছয় প্রকার

৩. ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে হাজার টেলিফোন গ্রাহক ছিল?
ক. ১৮ হাজার
খ. ২৪ হাজার
গ. ৩০ হাজার
ঘ. ৪০ হাজার

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :
১. গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য কি কি?
২. গণমাধ্যম হিসেবে বেতার-টেলিভিশনের গুরুত্ব কতটুকু?

রচনামূলক প্রশ্ন :
১. গণমাধ্যমের কার্যকারিতা আলোচনা করুন।
২. গণমাধ্যমের গুরুত্ব বর্ননা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. খ, ৩. গ।

সহায়ক গ্রন্থ:
১. M., Mcluhan, Understanding Media
২. F., Williams, The Communication Revolution.